# বাংলা অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

আত্মপরিচয় অনুসন্ধান প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই আনন্দের। মানুষ নিজেকে জানতে চায়। আর নিজেকে জানতে হলে নিজের অতীত অনুসন্ধান করতে হয়।

কে আমি? আমার পূর্বপুরুষ কারা? কী ছিল তাঁদের পেশা? কেমন ছিল তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা? কোথা থেকে এসেছিলেন তারা? এমন হাজারটা প্রশ্ন করে মানুষ আত্মানুসন্ধান করতে চায়, শিকড়খুঁজে বের করতে চায়। শিকড় খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর পূর্বপুরুষের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং দুর্বলতাগুলো জানতে পারে। এই জ্ঞান মানুষের বর্তমানকে কার্যকরভাবে চালিত করতে সাহায্য করে। সুসংহত এবং দূরদর্শী করে। আর নিজের যেকোনো পদক্ষেপ যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

সমাজ ও সংস্কৃতি রচিত হয় মানুষের হাত ধরে। মানুষকে উপজীব্য করে। কোনো একটি অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমেই সে অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন এবং প্রাচীন মানুষের প্রাপ্ত দেহাবশেষ থেকে শুরু করে নানান প্রকারের উৎসের ভিত্তিতে আমরা শুরুতেই আঞ্চলিক বাংলা ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে আগত মানুষ ও বিভিন্ন জনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করব। এরপর আমরা অনুসন্ধান করে দেখব, কীভাবে সেই মানুষেরা শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক যাযাবর জীবন থেকে ধীরে ধীরে স্থায়ী বসতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। নগর ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত দৈনন্দিন উপকরণ, উৎসব, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্য ও বহুত্বে ভরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। আঞ্চলিক বাংলার বিভিন্ন স্থানে খননকাজ চালিয়ে প্রাচীন মানুষের যেসব বসতিকেন্দ্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, তাম্রলিপ্তি, উয়ারী-বটেশ্বর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্নস্থানগুলোর মধ্যে, বাংলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবি একটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। তাম্রলিপ্তি বাংলার প্রাচীনতম সমুদ্র বন্দর নগরী। মহাস্থানগড় বাংলার উত্তরাংশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল ময়নামতি।

লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশটি প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত বাংলা অঞ্চলের আনুমানিক সীমানা।

## আঞ্চলিক বাংলায় মানুষের প্রাথমিক বসতি ও পরিচয়

যুগে যুগে নানান ধারার মানুষ পৃথিবীর নানান অংশ থেকে বাংলা অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলা অঞ্চলের নানান রকমের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকীয়ে রেখেছে। আবার প্রকৃতির অফুরন্ত নিয়ামক গ্রহণ করেই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের পথ রচনা করেছে। চলো, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার আলোকে এই মানুষের দৈহিক গড়ন এবং ভাষাভিত্তিক আদি পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নিই।

## দৈহিক গড়নভিত্তিক জনগোষ্ঠী

পাণ্ডুরাজার ঢিবির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছ। বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশে প্রাচীনতম সুসংগঠিত মানববসতি পাণ্ডুরাজার ঢিবি। আদি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। এই কঙ্কাল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের। নৃ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী, বাংলা অঞ্চলের আদিতম দৈহিক গড়নের মানুষ ছিল প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড। এরাই খুব সম্ভবত বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। সব মানুষের জীবন ছিল শিকার ও চাষকেন্দ্রিক। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড দেহ গড়নের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলত তার ভিত্তিতে তাঁদেরকে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বলা হয়। এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীরও ছিল অসংখ্য ধারা ও উপধারা। প্রাচীন সংস্কৃত

সাহিত্যে যাদেরকে নিষাদ বলা হয়েছে এবং বর্তমানকালে আমরা যাদের সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে চিনে থাকি, তারা সবাই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ।

দৈহিক গড়নের ভিত্তিতে আরও যেসব জনধারা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে তার মধ্যে নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েড অন্যতম। নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েডদের মধ্যেও রয়েছে অনেক ধারা ও উপধারা। বাংলায় গারো নামে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, তারা মূলত মঙ্গোলয়েড জনধারারই ক্ষুদ্র একটা অংশ বা উত্তরাধিকার। হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলে বসবাস করার ফলে এই সকল মানুষের প্রায় সবাই মিলেমিশে নতুন যে জনধারা সৃষ্টি করেছে, তা বর্তমানে বাঙালি নামে পরিচিত।

## ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অল্প কিছু আগে বা পরে বাংলা অঞ্চলে যাদের আগমন ঘটে, তারা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উৎপত্তি কোথায় তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণের অনেকেই বলে থাকেন যে, দ্রাবিড় ভাষীরাই ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম বাসিন্দা। কেউ কেউ আবার এদের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত বলেও মত দিয়ে থাকেন। তবে এদের উৎপত্তি যেখানেই হোক, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের হাতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন নগর সভ্যতার নাম হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা। চীনা-তিব্বতি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় কথা বলা মানুষের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডে। আজ থেকে আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে গবেষকগণ দাবি করেন।

দৈহিক গড়ন ও ভাষার ভিত্তিতে আদিকালে বাংলা অঞ্চলে আগত ও বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় আমরা সংক্ষেপে জেনে নিয়েছি। দূরবর্তী ভূখণ্ড হতে আগমন ও বসতি স্থাপনের এই ধারা যে শুধু প্রাচীন যুগেই চলমান ছিল তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আর্য সহ উপরের উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মানুষ নানান পরিচয় (যেমন: মৌর্য, কুষাণ, হূণ, গুপ্ত, আরব, যবন, তুর্কী, আফগান, পারসিক, তাজিক, মুঘল, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ডেনিশ, রাজপুত প্রভৃতি) ধারণ করে বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ঘটিয়েছে। অপেক্ষাকৃত আগে বসতি স্থাপনকারী জনধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে।

**অনুশীলনী**

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আমরা হয়ে ওঠেছি একই সঙ্গে অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। চলো, এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য অনুধাবনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও দেহগড়নের মানুষের নাম চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন লিখি।

## বাংলা অঞ্চলে সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন ও অবিরাম বদলের ইতিহাস

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইতিহাসের উষালগ্নেই সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। প্রত্যেকটি সমাজে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে। অন্যদিকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতির অংশ। হাজার বছরে গড়ে ওঠা রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি,

আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-সংস্কৃতি, লোকাচার, বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংগীত, নন্দন-শিল্প, জামা-কাপড়, খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সবকিছুই সংস্কৃতি। সমাজ ও সংস্কৃতি কোনো একরৈখিক প্রতিষ্ঠান নয়। স্থান এবং কালভেদে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে পার্থক্য তৈরি হয়। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার মানুষ বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখন অবধি আমরা যদি বাংলা অঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই, অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করব, রাজনৈতিক এবং ধর্ম-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আর বিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানেও এসেছে বড়ো পরিবর্তন। আগে থেকে বিদ্যমান একটি সমাজ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছেন। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির এই নিরন্তর ভাঙা-গড়া, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ বৈচিত্র্যে, বহুত্বে আর বহুমাত্রিকতার অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

## সমাজ-সংস্কৃতি গঠনের আদি পর্ব: কৃষি আবিষ্কার থেকে নগর বিপ্লবের কথা (প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ)

আদিকালে মানুষ যখন চাষাবাদ জানত না, স্থায়ী বসতি ছিল না, তখনো তারা দলবদ্ধ হয়েই শিকার এবং সংগ্রহের কাজ করত। আদিম সেই সমাজকে বলা হয় গোত্রভিত্তিক সমাজ। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই, হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জি চা-বাগান, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর কোনো কোনোটির বয়স আনুমানিক দশ হাজার বছর। এসব প্রত্ননিদর্শন থেকে বাংলা অঞ্চলের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজের মানুষের বিচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নারী শিকারির হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য। আবিষ্কৃত প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে।

মানুষের সমাজ কাঠামোতে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আসে কৃষির আবিষ্কারের ফলে। আদি যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই গোত্রগুলো ভেঙে যেত এবং পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যেত। কিন্তু কৃষির আবিষ্কারের ফলে এই ভাঙন থেকে তারা মুক্তি পায় এবং কোনো একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে চাষের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে জীবন ধারণে সক্ষমতা অর্জন করে। কৃষির আবিষ্কার মানুষকে খাদ্যের সংকট থেকে মুক্তি দেয়। স্থায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। গোত্রভিত্তিক জীবন ধারার পরিবর্তে গ্রাম বা নগরভিত্তিক স্থায়ী জীবন ধারার সূত্রপাত ঘটায়। মহাস্থানগড় এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি প্রত্নস্থলে খননকাজ পরিচালনা করে দেখা গেছে, এই স্থানগুলোতে নগর প্রতিষ্ঠার আগে কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বসতির সূচনা হয়েছিল। চাষাবাদের পাশাপাশি তারা শিকার এবং মাছ ধরার কাজেও দক্ষ ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই ধীরে ধীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি নগর সমাজের উদ্ভব হয়।

বাংলা অঞ্চলের কৃষিনির্ভর এলাকাগুলোতে বা গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই ফসল কাটার দিনটি ছিল সবচেয়ে আনন্দের দিন। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায়, অর্ধচন্দ্রাকৃতির কাস্তে হাতে নিয়ে কয়েকজন কৃষক কৃষি কাজ করছেন। অপর একটি ফলকে ধরা দিয়েছে প্রাচীন আশ্চর্য সুন্দর একটি ফসল কাটার উৎসবের দিন। ফসল হাতে নিয়ে বাদ্যবাজনা সহযোগে নৃত্যরত মানুষের এই চিত্র প্রথম/দ্বিতীয় শতকে অঙ্কীত হলেও তার মধ্যেই বাংলার কৃষকদের জীবনের একটি শাশ্বত রূপ ধরা পড়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে স্থায়ী বসতির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে এই কৃষির সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং অবিচ্ছেদ্য।

কয়েকজন পুরুষ একটি শিকার করা পশু নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করছে। আঙিনায় কয়েকজন নারী শস্য চাষ করছে। আদি যুগের কৃষি ও শিকার জীবনের দৃশ্য কল্পনা করে আঁকা ছবি।

মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মধ্যে ইতিহাসের আদিকালেই লোকজ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল।

**অনুশীলনী**

আদি যুগে বাংলা অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানলাম। উপরের পাঠ থেকে চলো নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি-

- আদি যুগে মানুষের পারিবারিক কাঠামো কেমন ছিল?
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান উৎসবগুলো কেমন ছিল?

## আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমন, নতুন বসতি, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল (৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

আর্য ভাষার মানুষেরা আনুমানিক ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। বেদ সাহিত্যে এবং মহাভারত ও রামায়ণে বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁদের রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ়-সমতট এলাকায় একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেন।

গুপ্ত যুগের সোনার মুদ্রার নমুনা

গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ঘোড়ায় চড়া প্রতিকৃতি খোদিত সোনার মুদ্রা

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি অঙ্কীত সোনার মুদ্রা

গুপ্ত যুগের মন্দির

এই দেয়াল ঘেরা স্থানটি একটি নগরী ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র এটি। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধারসহ চারদিকে পরিখা ও ডান দিকে করতয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতয়ার তীরেই মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই রাজধানী নগরটি স্বাধীন বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় পড়েছে। এই নগরে প্রথম মানব বসতি স্থাপিত হয় মৌর্য শাসকদের শাসনকাল শুরু হবারও আগে। পনেরো শতকেও এই নগরে জনবসতি অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে নগরটির বৈশিষ্ট্য এবং বসতির ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে জনবসতি ছিল। এরপর বহিঃশক্তির আক্রমণ বা প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের কারণে নগরটি পরিত্যক্ত হয়। ধীরে ধীরে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। আধুনিককালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থানটিতে খননকাজ পরিচালনা করে মাটির নিচ থেকে সম্পূর্ণ নগরটির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করেন। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করে থাকেন ইতিহাসবিদগণ। ইতিহাস গবেষণার প্রথা-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল মেনে, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালিয়ে একজন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন সময়ের মানুষদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করে থাকেন।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করা একজন যোদ্ধার ছবি। সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের রাজাগণ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেন এই যোদ্ধাদের পেশিশক্তি ব্যবহার করে। যোদ্ধারা বাস করতেন নগরের ভেতরে।

## আঞ্চলিক পরিচয় গঠন, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব (৬০০ থেকে ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

ষষ্ঠ শতকের পর বাংলা অঞ্চলে বঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে বলে বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। ৫ জন স্বাধীন রাজা ষষ্ঠ/সপ্তম শতকে ধারাবাহিকভাবে এখানে রাজত্ব করেছেন। তারা হলেন গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, ধর্মাদিত্য, দ্বাদশাদিত্য ও সুধান্যাদিত্য। বঙ্গের কিছু পরে গৌড় নামে আরও একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের স্বাধীন একজন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। রাজবংশের অধীনে বাংলা অঞ্চলে ধীরে ধীরে সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো মজবুত হয়। নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো স্পষ্ট হতে থাকে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুত্ব নিয়েই গড়ে ওঠে সামাজিক বুনিয়াদ। বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপনার মধ্যে স্তুপ, বিহার, মন্দির উল্লেখযোগ্য। বাংলায় প্রথম মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শতকের একটি পোড়ামাটির ফলকে। মন্দির স্থাপত্যের আদিমতম রূপ উৎকীর্ণ হয়েছে ফলকটিতে। ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মন্দির নির্মিত হতে শুরু করে। নবম থেকে এগারো শতকে পাল ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির এবং মন্দির সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল।

বৌদ্ধশিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল বিহার। এখানে সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকীৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। বাংলা অঞ্চলে নির্মিত বিহারগুলোর মধ্যে সোমপুর মহাবিহার (বর্তমানে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর), শালবন বিহার (বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতিতে অবস্থিত), রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) ছিল জগৎ বিখ্যাত।

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহারের নাম সোমপুর বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ মহাবিহার। বিশাল এই স্থাপনার চারদিকে ছিল ১৭৭টি বসবাসের উপযোগী কক্ষ, যেখানে বসে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানচর্চা করতেন। বিস্তৃত প্রবেশপথ, অসংখ্য নিবেদন স্তূপ এবং ছোটো ছোটো মন্দির শোভিত বিহারের কেন্দ্রে রয়েছে সুউচ্চ একটি মন্দির। খনন কাজের মাধ্যমে এখানে পাওয়া গিয়েছে অনেক পোড়ামাটির ফলক (টেরাকোটা), প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি। এসব ফলকে অঙ্কীত চিত্র থেকে আমরা সে যুগের মানুষের জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারি। এসব নির্দশন বাংলার স্থাপত্য ও ভার্স্কয শিল্পের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহার ও মন্দিরসমূহের ছবি।

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অন্তিচক নামক স্থানে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি।

বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি। প্রাচীন বাংলা অঞ্চলে অবস্থিত এই বিহার ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাবিহার। বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকীৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সংগীত ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র ছিল এই রকম বিহারগুলো।

সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির দেখতে এমন ছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিকগণ

শালবন বিহার। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলায় বিহারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

লতিকোট বিহার বা লতিকোট মুড়া। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলায় বিহারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। পবনদূত, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত নামে বেশকিছু গ্রন্থ এ সময় রচিত এবং সংকলিত হয়। এসব গ্রন্থ থেকে সমকালীন বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলোও তাই বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উৎস হিসেবে পণ্ডিতগণের কাছে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শাহানারা হোসেন এই সময়ে সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা করে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। বাংলা অঞ্চলের মানুষের যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা এই শ্লোকগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন 'চর্যাপদ' রচিত হয়েছিল অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। চর্যাপদের পদগুলোতে সেই সময়ের ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির নানান বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের দারিদ্র্য, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, বৈষম্য আর বিভিন্ন পথে সাধনার মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণের নানান উদাহরণ।

পাল যুগে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।

## চর্যাপদ

চর্যাপদ হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যের নমুনা। চর্যাপদ থেকে বাংলায় বসবাসকারী নানান ধারার মানুষের নাম, পরিচয় এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়। ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামক মানুষদের কথা জানা যায়। এসব মানুষ আর্যভাষী মানুষদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলার আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নিজস্ব রীতি-নীতি আর প্রথা-পদ্ধতি মতো সমাজ গঠন করে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করছিলেন। চর্যাপদ কাব্যে শবরদের জীবনধারা সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। শবর মানুষরা অপেক্ষৃত উঁচু এলাকা বা পাহাড়ে বসবাস করত। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা সুন্দর ফুল আর পাখির রঙিন পালক দিয়ে শবর বালিকারা সাজসজ্জা করত। উপরের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মানুষের নাম এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে জেনেছি। চর্যাপদ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের কথাও জেনেছি। এসবগ্রন্থে বাংলার মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কীত হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করে চলো একটা তুলনামূলক আলোচনা করি।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলার মানুষ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে এবং চিত্রযুক্ত পুঁথিতে। নবম শতকে বাংলার বরেন্দ্রীতে ধীমান এবং বীতপাল নামে শিল্পী বাস করতে জানা যায়। চিত্রকলায় তারা ছিলেন সেই যুগের বিখ্যাত মানুষ।

পালবংশের রাজা রামপালের সময়ে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে যাকে প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। বিভিন্ন স্থাপনার দেয়াল অলংকরণ, ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর শোভাবর্ধন এবং গৃহসজ্জায় চিত্র অঙ্কনের রীতি বাংলায় আবহমানকাল ধরেই চর্চা হয়ে আসছে।

অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চল বা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারে এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত ও চিত্রিত হতো।

ভাস্কর্য শিল্প বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল একটি দিক। বাংলা অঞ্চলে শিল্পটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে এবং ৯০০ সাধারণ অব্দের মধ্যে এটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিভিন্ন ধরনের পাথর, আগ্নেয়শিলা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলোতে। নবম শতাব্দী থেকে কালো আগ্নেয়শিলার ভাস্কর্য দেখা যায়। ভাস্কর্যগুলোর অপূর্ব শিল্পগুণের কারণে অনেকেই একে পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরীতি হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

বিভিন্ন প্রাচীন সূত্র ও লৌকীক আচার থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা নৃত্য-গীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাংলার প্রাচীনতম কাব্যসংকলন চর্যাপদের একটি কবিতায় একজন ডোম্বী রমণীর কথা বলা হয়েছে। সে যখন নৃত্য করে, মনে হয় যেন একটি ফুল চৌষট্টিটি পাপড়ি মেলে দিয়ে শোভা/সৌন্দর্য বিকীরণ করছে। পাহাড়পুর বিহারে পোড়ামাটির যেসব ফলক পাওয়া গেছে সেখানেও প্রাচীন বাংলার মানুষের নানান রকম উৎসব ও আনন্দের সুন্দর সব চিত্র আমরা দেখতে পাই। গায়ক ও গায়িকারা হাতে ডঙ্কা, বাঁশি, কাসর, করতাল বাজিয়ে গান গাইছে। বিবাহ উৎসবে পুরুষেরা গান গাইতো, মেয়েরা নৃত্য করত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার আদি এই অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির গল্পই মূলত পরবর্তীকালে লিখিত কাব্য এবং পোড়ামাটির ফলকগুলোর উৎকীর্ণ হয়েছে।

## অনুশীলনী

উপরের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মানুষের নাম এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে জেনেছি। সুভাষিত রত্নকোষ এবং চর্যাপদ নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের কথাও জেনেছি। এসব গ্রন্থে বাংলার মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কীত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করে চলো একটা তুলনামূলক আলোচনা করি।

১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দের শুরুর দিকেই বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম দিকে তুর্কী-আফগানদের আগমন ঘটে। তাঁরা বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে লখনৌতি নামে একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করে। এরপর থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলার বিভিন্ন অংশে নানান মতধারার যোদ্ধা, বণিক, ধর্মপ্রচারক পির, দরবেশ, সুফি-সাধকদের আগমন ঘটে। নবাগত শ্রেণির অনেকেই বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে এখানে নতুন ধর্ম-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি আর সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। খানকাহ, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ নতুন ধারার নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষতা ও সুফিদের তৎপরতায় বাংলা অঞ্চলে আদি বসতি স্থাপনকারী মানুষদের কাছে নতুন এই ধর্ম-সংস্কৃতির কথা পৌঁছাতে শুরু করে।

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান থেকে যেসব মুসলমান বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন তারা সেসব ভূখণ্ড থেকে নিয়ে আসেন নতুন কিছু সামাজিক বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদান। এভাবেই বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করেছে।

উপরে উল্লিখিত মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় একের পর এক মসজিদ, দরগাহ, খানকাহ নির্মিত হয়েছে। স্থাপনাগুলোর মধ্যে পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়-লখনৌতির ছোটো সোনামসজিদ ও বড়ো সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা অঞ্চলে নির্মিত আদিনা মসজিদটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায়। এটা মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৭৩ সালে সিকান্দর শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু বাংলা অঞ্চল নয়, গোটা উপমহাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি মসজিদ। বর্তমানে এটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় টিকে রয়েছে। আদিনা মসজিদের অলংকৃত দেয়াল সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনকালে খান জাহান নামক একজন সুফিসাধক সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে জনবসতি গড়ে তোতুলে। খান জাহান ছিলেন একজন নির্মাতা। বর্তমানে যেখানে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট অবস্থিত সেই এলাকায় তিনি অনেকগুলো শহর, মাদ্রাসা, মসজিদ, সেতু, নির্মাণ করেছিলেন। নতুন এক স্থাপত্যরীতিতে নির্মাণ করেন ষাটগম্বুজ মসজিদ।

সুলতানি আমলে বাংলা অঞ্চলে নির্মিত একটি বিখ্যাত মসজিদ হচ্ছে, আদিনা মসজিদ। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায় এটির এখনো ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৩৭৩ সালে বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ষাটগম্বুজ মসজিদ। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনামলে খান জাহান নামের একজন সুফিসাধক সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে জনবসতি গড়ে তোলেন। এই মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন।

ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলায় মোগল শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে এবং শতকের গোঁড়ার দিকেই তা বাংলা অঞ্চলের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

মসজিদ, দুর্গ এবং কাটরার পাশাপাশি বিখ্যাত কিছু মন্দিরও নির্মিত হয় মোগল শাসিত বাংলা অঞ্চলে। এর মধ্যে বর্তমান পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির, পুটিয়ার শিবমন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্দির স্থাপত্যটি নবরত্ন বা নয় চূড়ার মন্দির। কান্তজির মন্দিরের বাইরের দেয়াল জুড়ে বসানো হয়েছে অনন্য সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। এসব ফলকে অঙ্কিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের নানান ঘটনাবলি আর তৎকালীন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-সংস্কৃতির খণ্ডচিত্র। এই মন্দির ছাড়াও আরও অসংখ্য মন্দির বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছিল। বাংলার গ্রামের কুঁড়েঘরের আদলে দোচালা আর চৌচালা রীতিতে অনেকগুলো স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল।

পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির

স্থাপত্যকলার পাশাপাশি সংগীত, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিত্রকলাসহ শিল্প-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে এসময় লক্ষ্যণীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক বাংলা অঞ্চলে ফসল কাটার দিনগুলো যে আদিকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি। মোগল শাসনামলে এই ফসলের মৌসুম ধরেই অনুষ্ঠিত হতো পুণ্যাহ নামে একটি উৎসব। 'পুণ্যাহ' ছিল মূলত কৃষক ও রায়তদের কাছ থেকে জমিদারদের রাজস্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, যাত্রা, মেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াইসহ নানান আনন্দ উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হতো। কৃষিভিত্তিক বাংলার সকল মানুষের কাছে ফসল তোলার দিনটি ছিল হাজার বছরের এক অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশের দিন।

১৩০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হচ্ছে মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা। মহাকাব্যের আদলে লেখা এই গীতিকবিতাগুলো বাদ্যবাজনাসহ গানের মতো করে পরিবেশন করা হতো। শুরুর দিকে সংস্কৃত এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষায় বাংলা অঞ্চলের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চা করতেন। প্রাকৃত ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা। এই ভাষা থেকেই ধীরে ধীর বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

এই সময়কালে বাংলায় আরবি এবং ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে। বাংলা অঞ্চলে মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কৃত এবং পালি ভাষার পাশাপাশি এই দুটি ভাষাও গৃহীত হয়। বাংলা অঞ্চলে মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দ মিশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

**অনুশীলনী**

চলো, একটা অনুসন্ধানমূলক কাজ করি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে ১৮০০ সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগমনকারী এবং বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় খুঁজে বের করি। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই সকল মানুষের পৃথক পৃথক সামাজিক রীতি-নীতিগুলো খাতায় লিখি এবং কীভাবে এই পৃথক রীতি-নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটে, তা শ্রেণিকক্ষে দলগত উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরি।

## সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য আর বহুত্ব, ভাষাভিত্তিক পরিচয় গঠন (১৮০০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত)

পনেরো শতকের শেষ ভাগে বাংলা অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের জলপথে নতুন করে আগমন শুরু হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ বণিকেরা আঞ্চলিক বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজ ক্ষমতা অধিকার করে নিলে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন এক পরিবর্তনের ঢেউ ওঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়। শাসনকার্য পরিচালনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইংরেজ বাংলায় আসে। ধীরে ধীরে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হতে শুরু করে। এর ফলে বাংলা অঞ্চলের

মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এই সময় থেকেই কলকাতা থেকে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলা অঞ্চলের ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। ইউরোপের নানান দেশ এবং ভাষার গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার ঘটে, সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার দূর হতে থাকে এবং এক সামাজিক বিপ্লব সংঘঠিত হয়।

এই বিপ্লবের ফলে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। সামাজিক জীবনে আরও নানান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দানবীর হাজি মুহম্মদ মুহসীন, হাজি শরীয়তুল্লাহ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ।

উনিশ শতকে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হচ্ছে বাংলা সাহিত্য নতুন রূপে উপস্থাপন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাত ধরে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে; যা ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্ দীন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবাল প্রমুখের লেখনীর মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

বাংলা অঞ্চলে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগরণের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় উনিশ শতককে। ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বাংলা অঞ্চলের মানুষ কিছু কিছু জানতে শুরু করে। যেকোনো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি শিক্ষিত তরুণদের হাত ধরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। এরপর কখনো নিরস্ত্র আবার কখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পাশাপাশি বাংলা প্রদেশকেও দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বাংলা ভেঙে এর পশ্চিম অংশকে যুক্ত করা হয় ভারতের সঙ্গে আর পূর্ব অংশকে যুক্ত করা হয় ২২০০ কীলোমিটার দূরের পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের সম্মতি গ্রহণ না করেই তৎকালীন ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদগণ ধর্মের ভিত্তিতে এই ভাগ করেন। হিন্দু জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পশ্চিম অংশকে ভারতের সঙ্গে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল পশ্চিম বাংলায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, একইভাবে পূর্ব বাংলায় রয়েছে বিপুল সংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান আর পূর্ব বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিজাত শাসকেরা তাঁদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। শাসকদের এই প্রস্তাবের বিপরীতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ে সক্ষম হয় পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। কিন্তু পূর্ব বাংলা এবং পাকিস্তানের নানান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের তাতে অবসান ঘটেনি। ১৯৫৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার নাম আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। তাতেও সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। বাঙালি মুসলমান, হিন্দু

ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের রেশ ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রেডিও-টেলিভিশনসহ নানান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলার পূর্বভাগের শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সাধারণ মানুষ পাকিস্তান সরকারের এই ঘোষণায় আবারও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে মানুষ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকেন।

### ছায়ানট

পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের শাসনকালে প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম ছায়ানট। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় রবীন্দ্র ভাবনা এবং রবীন্দ্রসংগীতকে অবলম্বন করে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগীতকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনার সমগ্রতাকে বরণ ও বিকাশে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক সংগঠনটি সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকর্মী, বিজ্ঞানী, সমাজব্রতীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাকিস্তানের এলিট স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির পথযাত্রার অংশ ছায়ানট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন অবধি বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও মহামারিতে বিপন্ন মানুষের মধ্যে ত্রাণসহায়তা সহ নানান ধরনের সেবামূলক কাজেও অংশ নেয় এই সংগঠন।

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম দিকভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত হয়নি; কারণ বঙ্গীয় বদ্বীপের মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলা অঞ্চলে ধর্ম-সংস্কৃতির পরিবর্তন আর রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সংস্কৃতির নানান রকমফের দেখা যায়, বাংলা অঞ্চলের প্রত্যন্ত অংশে যেগুলোকে লোকজ সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির এই লোকজ উপকরণ বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রাণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা বাংলা অঞ্চলে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে মিলনে-বিরোধে বাংলার সংস্কৃতির এই লোকজ ধারা টিকে রয়েছে। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে শক্তিশালী রূপে গড়ে উঠেছে তোমরা মনে রাখবে, বাংলার মানুষেরা আবহমানকালের ধারা অনুযায়ী পুরোনো সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিকে বজায় রেখে এবং নতুনের কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সব সময় সক্রিয় থেকেছে।

আঞ্চলিক বাংলার মানুষ যেভাবে ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপন করে সেখানেও রয়েছে একটা নিজস্বতা। উৎসবে রয়েছে স্বকীয় কিছু মাত্রা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষের প্রধানতম ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদ, ঈদে-মিলাদুন্নবী, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পুজা, দোল উৎসব, দেওয়ালি, শবে-বরাত, মহররম, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়োদিন, বিজু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল আয়োজনে বৈশাখের প্রথমদিন উদযাপন করেন বাংলা নববর্ষ উৎসব। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে হালখাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে বের হয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণকারী মঙ্গল শোভাযাত্রা। তোমরা জেনে খুশি হবে যে, ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রা 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন আর কেবল বাঙালির নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ।

গান বা সংগীত বাংলা অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। লালন ফকির, হাসনরাজা, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আবদুল আলীম, শাহ আব্দুল করিমের গান বাংলার মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়ায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান বাংলা গানের জগৎকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসও একই সঙ্গে প্রাচীন এবং আধুনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের সংসদ ভবন, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়াম প্রভৃতি ভবনগুলোতে পাশ্চাত্য নির্মাণধারার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'বাটারফ্লাই ক্যানপি' বা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে টিএসসির মূল অডিটোরিয়াম ভবনটিতে বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে চালাযুক্ত স্থাপত্য রীতির সঙ্গে গ্রিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়াম ভবনের ছবি। বাটারফ্লাই ক্যানপি বা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে এই স্থাপনাটিকে বাংলার কুঁড়েঘরের আদল চালাযুক্ত স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক আলোচনাতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে চিত্রকলা। তোমরা নিশ্চয়ই এস এম সুলতান ও জয়নুল আবেদিনের মতো প্রতিভাবান চিত্রকরদের নাম শুনেছ। এসএম সুলতানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আবহমানকালের বাংলার মানুষের সক্ষমতার ইতিহাস আর টিকে থাকার অনুপ্রেরণার গল্প। সুলতানের চিত্রকর্মে বাঙালি কৃষক সবসময় শক্তিশালী মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সংগ্রাম'। বাংলার মানুষের জীবনে উপগত নানান দুর্যোগ, দুঃশাসন, প্রতিকূলতা ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে মহান এই চিত্রশিল্পীর তুলিতে।

বাংলার আরেকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন এস এম সুলতান। এস এম সুলতান কৃষিভিত্তিক বাংলার কৃষাণ-কৃষাণীদের ছবি এঁকেছেন অত্যন্ত বলশালী অবয়বে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে নবান্ন, মনপুরা এবং সংগ্রাম। বাংলার মানুষের জীবনের উপগত নানা দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন এবং সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে

## অনুশীলনী

### আত্মপরিচয় অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন

আদিকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল অবধি বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ। সমাজ-সংস্কৃতির এই গতিপথ নির্ধারণে রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদানগুলোরও রয়েছে কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজে আমাদের পরিচয় গঠন প্রক্রিয়ায় যুগে যুগে নানান উপাদান যুক্ত হয়েছে। নানান ধারার মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর ফলে বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা লাভ করেছি এক অনন্য আত্মপরিচয়। চলো, আদিকাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি যেসব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, সেগুলো উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন লিখি।